বাঙলা উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের দান ও কৃতিত্ব

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীগণ বাঙলা গদ্যভাষাকে ছাত্রপাঠ্য পুস্তকে ব্যবহার করে সর্বপ্রথম তার ব্যবহার উপযোগিতা প্রদর্শন করেন। অতঃপর রাজা রামমোহন রায় বেদান্তাদি গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশাদি দ্বারা বাঙলা গদ্যের ভার বহনেব শক্তি বৃদ্ধি করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত দেশ-বিদেশের জ্ঞানের বিষয়কে যুক্তি-বুদ্ধির সময়ে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বাঙলা গদ্যে যথেষ্ট তীক্ষ্ণতাও আরোপ করেন। অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই গদ্যকে শিল্পসুষমা-মণ্ডিত করে সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের উপযোগী করে তোলেন। তবে বাঙলা গদ্যের এই ধারাটি একান্তভাবেই সাহিত্যিক গদ্যের ধারার, দৈনন্দিন জীবনের কাজে ব্যবহৃত 'কেজো গদ্যে'র এতে প্রবেশাধিকার ছিল না। উইলিয়ম কেরী এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অপর কোন কোন পণ্ডিত কথ্য বাঙলাকেও গ্রন্থবদ্ধ করেছিলেন। উনিশ শতকের প্রথম পাদেই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রারম্ভেই প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম প্যাঁচা) মৌখিক গদ্যরীতিকে ও কখন কখন কথ্যভাষাকেও সাহিত্যে ঠাই দিলেন, কিন্তু তা যথাযথ সমর্থন বা স্বীকৃতি লাভ করে নি। মাইকেল মধুসূদন তো এই ভাষাকে 'মেছুনীদের ভাষা' বলেই বিদ্রুপ করেছিলেন। এমন সময় বাঙলা গদ্যসাহিত্যে আবির্ভূত হলেন সব্যসাচী বঙ্কিম। তিনি একদিকে প্রাগুক্ত দুই রীতির গদ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধন করে বাঙলা গদ্যভাষাকে দিলেন একটা চিরায়ত আদর্শ রূপ, অপরদিকে সৃষ্টি করে চললেন বাঙলা সাহিত্যের সৃষ্টিধর্মী রসসাহিত্যের প্রধান ধারা—যাকে বলা চলে কথাসাহিত্য বা উপন্যাস। বাঙলা গদ্যের এই ধারাবাহিক ক্রমবিবর্তনের পরিচয় দিতে গিয়ে মনীষী অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন, "উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে দেখি বাঙলা গদ্যে প্রয়োজনধর্মেরই প্রাধান্য, দ্বিতীয় পাদে দেখি এই প্রয়োজনধর্মের সহিত শিল্পধর্মের মিশ্রণ, তৃতীয় পাদে দেখি প্রয়োজনধর্মের উপরে শিল্পধর্মেরই প্রাধান্য, চতুর্থ পাদে শিল্পধর্মেরই দৃঢ় প্রতিষ্ঠা।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা শুরু হয়েছিল তার ছাত্রজীবনেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরে' কলেজীয় কবিতা-যুদ্ধে কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে। এরপর তিনি ইংরেজি ভাষায় লিখলেন তার প্রথম উপন্যাস Rajmohan's wife এবং তারপরই ফিরে এলেন স্বধারায় বাঙলা উপন্যাস রচনায়। বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙলা ভাষায় প্রথম যথার্থ ঔপন্যাসিক এবং বলা চলে এখনও পর্যন্ত অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তিনি শুধু উপন্যাসের আদি স্রষ্টাই নন, বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক। অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, "বঙ্কিমের হাতে বাঙলা উপন্যাস পূর্ণ যৌবনের শক্তি ও সৌন্দর্যলাভ করিয়াছে।....তাহার সবকয়টি উপন্যাসের মধ্যেই একটা সতেজ ও সমৃদ্ধভাব খেলিয়া যাইতেছে, জীবনের গভীর রহস্য ও বিকাশগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং জীবনের মর্মস্থলে যে বিমূঢ় রহস্য আছে, তাহার উপর আলোকপাত করা হইয়াছে। তিনি জীবনকে বিচিত্র রসে পূর্ণ ও কল্পনার ইন্দ্রজালে বেষ্টন করিয়াছেন বটে কিন্তু সত্যের সূর্যালোকের পথ অবরুদ্ধ করেন নাই ও ইহাই তাহার চরম কৃতিত্ব।"

বঙ্কিম-রচিত মোট উপন্যাসের সংখ্যা ১৪টি। বিষয় অনুযায়ী উপন্যাসগুলিকে নানা জনে নানারূপে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে থাকেন। সর্বাধিক যুক্তিসম্মত শ্রেণীবিভাগ নিম্নোক্ত রূপে হাতে পারে—

(ক) ঐতিহাসিক ও রোমান্সধর্মী উপন্যাস- ১. দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), ২. কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), ৩. মৃণালিনী (১৮৬৯), ৪. যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), ৫. চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), ৬. রাজসিংহ (১৮৮৪), ৭. সীতারাম (১৮৮৭);

(খ) সামাজিক ও গার্হস্থ্যধর্মী উপন্যাস- ৮. বিষবৃক্ষ (১৮৭৬), ৯. রজনী (১৮৭৭), ১০. কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮);

(গ) দেশাত্মবোধক উপন্যাস- ১১. আনন্দমঠ (১৮৮২), ১২. দেবী চৌধুরাণী (১৮১৪);

(ঘ) উপন্যাসিকা- ১৩, ইন্দিরা (১৮৭৩) এবং ১৪. রাধারাণী (১৮৭৬)।

সংখ্যার বিচারে বঙ্কিম-রচিত ঐতিহাসিক-রোমান্স জাতীয় উপন্যাসগুলিই সর্বাগ্রগণ্য, কিন্তু এদের মধ্যে একমাত্র 'রাজসিংহ' ব্যতীত অপর কোনটিই যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে গণ্য হতে পারে না। কারণ এ জাতীয় সবকটি উপন্যাসেই ঐতিহাসিক পটভূমিকা রয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু ঐতিহাসিক চরিত্রও রয়েছে, এ সবই গৌণ—এখানে ইতিহাসরস অনুপস্থিত কিন্তু সাহিত্যরসের অভাব না ঘটায় এদের রোমান্স' নামে অভিহিত করাই সঙ্গত। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে শুধু 'রাজসিংহ'কেই ঐতিহাসিক উপন্যাস রূপে চিহ্নিত করেছেন। অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন, "উপন্যাসে চরিত্র ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সহায়তায় যে গতি সঞ্চারিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের এই রোমান্সগুলিতে তৎস্থলবর্তী হয়েছে ঘটনার জটিলতা ও ঘাত-প্রতিঘাত। এ ছাড়াও ভাষা-ভঙ্গিতে কবিত্ব ও রোমান্টিক কল্পনার বর্ণসুষমা এবং ঘটনার আকস্মিকতায়, বৈচিত্র্যে এবং দৈবীশক্তির উপস্থাপনায় রোমান্সের প্রাধান্যে এই উপন্যাসগুলিকে যে পরিণাম-রমণীয়তা দান করেছে, তা ইতিহাস-ধর্মী নয় বলেই সাধারণতঃ বঙ্কিমের এই উপন্যাসগুলিকে 'রোমান্স' নামেই অভিহিত করা হয়।"

অবশ্য এই উপন্যাসগুলিতেও পারিবারিক এবং গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনীই প্রাধান্য লাভ করা সত্ত্বেও যে এগুলিকে সামাজিক উপন্যাস'রূপে গ্রহণ করা চলে না, তার কারণ এই যে, এদের কাহিনীগুলি অতীতকালাশ্রিত এবং বাস্তব ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক রহিত। বাঙলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'তে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ, বাঙলা-উড়িষ্যার অধিপতি পাঠান সুলতান কতলু খা প্রভৃতিকে নিয়ে আসা হয়েছে। কপালকুণ্ডলীয় প্রধানতঃ একটা ঐতিহাসিক কাহিনী থাকলেও তা মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত নয়। এতে এক অরণ্যচারিণী নারীকে লোকালয়ে নিয়ে আসার পর তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আলেখ্য চিত্রণই মুখ্য বিষয়। তুর্কী-আক্রমণ যুগের পটভূমিকায় রচিত মৃণালিনী উপন্যাসের পটভূমির বিশ্বাসযোগ্যতা সংশয়াতীত নয়, এতে একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দুটি রোমান্টিক কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। প্রাচীন সপ্তগ্রামের পটভূমিকায় রচিত যুগলাঙ্গুরীয় এক অনুল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্রকায় উপন্যাস। 'চন্দ্রশেখর পলাশীর যুদ্ধের অবসানকালের পটভূমিকায় রচিত। এতে মীরকাশিম-দলনী কাহিনী থাকলেও আসলে একটি সমাজ-সমস্যামূলক উপন্যাস। বাঙলা সাহিত্যে এটিতেই প্রথম অবৈধ প্রণয়কাহিনী স্থান লাভ করে। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনসমস্যাই এই উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করেছে।

'রাজসিংহ' শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাসই নয়, এটি তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসও বটে। রাজপুতকন্যা চঞ্চলকুমারীর পাণিগ্রহণেচ্ছু মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজীব এবং রাজসিংহের মধ্যে বিরোধ ঐতিহাসিক ঘটনা—একাধিক উপকাহিনী-সহ এটিকেই প্রধান উপজীব্য করে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। এতে যেমন উপন্যাস-ধর্ম অক্ষুন্ন আছে, তেমনি এটি ইতিহাস রসেও সমৃদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস 'সীতারামে' ঐতিহাসিকতা রক্ষা করা হয়নি এবং গ্রন্থের উদ্দেশ্যও যে ঐতিহাসিকতা নয়, এ কথা বঙ্কিম নিজেই স্বীকার করে গেছেন। তবে এর পটভূমিকার ঐতিহাসিকতা স্বীকার্য হলেও মূলতঃ এটি একটি গার্হস্থ্য উপন্যাস এবং এতে তাত্ত্বিকতা ও প্রচারধর্মিতা যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি উপন্যাসকেই গার্হস্থ্যধর্মী ও সামাজিক উপন্যাসের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। উপন্যাস রচনায় সিদ্ধিলাভ করার পরই বঙ্কিম এজাতীয় উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাই এগুলিতেই প্রকাশিত হয়েছে বঙ্কিমের ঔপন্যাসিক প্রতিভার চরম উৎকর্ষ। তবে স্ব-কালে বঙ্কিম স্বেচ্ছায়ই সমাজ-শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, কিছু নৈতিক বাধ্যবাধকতার দায়-দায়িত্ব তার কাঁধে চেপেছিল। তাই পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের শৃঙ্খলা ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য তাকে কোন

কোন ক্ষেত্রে নীতিবোধের কাছে শিল্পীসত্তা বিসর্জন দিতে হয়েছে। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু কিংবা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ রোহিণীর হত্যা এ জাতীয় ঘটনা, যা এক সময় বাঙলার সাহিত্যজগতে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই দুটি উপন্যাস শুধু পারিবারিক উপন্যাসই নয়, সমাজসমস্যামূলকও বটে। কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কাহিনীর গঠন, চরিত্রসৃষ্টি কিংবা শৈল্পিক উৎকর্ষ—যে কোন দিক থেকেই এই উপন্যাসটি বঙ্কিমের পরিণত প্রতিভার যোগ্য প্রকাশ বলেই স্বীকৃত। 'রজনী' অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং কোন এক বিদেশি উপন্যাসের প্রভাবে রচিত হলেও "গঠনরীতি এবং পরীক্ষা-প্রণালীর বিচারে এটি যে বাঙলা সাহিত্যের একটি অভিনব সৃষ্টি" এ কথা মেনে নিতে হয়। এই উপন্যাসে সমাজ-সমস্যা নয়, ব্যক্তিসমস্যাই প্রধান এবং অনেকের মতে বাঙলা ভাষায় এটিই প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস।

আনন্দমঠ এবং 'দেবী চৌধুরাণী'—সাধারণতঃ বঙ্কিম-রচিত এই দুটি উপন্যাসকেই দেশাত্মবোধক এবং তত্ত্বমূলক উপন্যাসরূপে গ্রহণ করা হলেও অনেকে এর সঙ্গে সীতারামকেও যুক্ত করে থাকেন। তবে এদের মধ্যে আনন্দমঠে দেশপ্রেম এবং তত্ত্ব যতটা স্পষ্টকণ্ঠে উচ্চারিত, অপর কোনটিই তত নয়। উপন্যাসের অপর সকল গুণে উন হওয়া সত্ত্বেও প্রধানতঃ দেশাত্মবোধের কারণেই বঙ্কিম-উপন্যাসসমূহের মধ্যে আনন্দমঠ সর্বাধিক প্রচার লাভ করেছে। বাংলায় মুসলিম শাসনের অন্তিম লগ্নে উত্তর বাঙলায় 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' এবং ভবানী পাঠকের সহযোগিতায় 'দেবী চৌধুরাণী' নাম্নী দুনেত্রীর ঐতিহাসিক কাহিনীকে ভিত্তি করেই ঐতিহাসিক পটভূমিকা সৃষ্টি করে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস দুটি রচনা করেন। আনন্দমঠ দেশজননীর উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গীকৃত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কাহিনীতে পরাধীন ভারতের মর্মবেদনা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলেও এর উপন্যাস-ধর্ম ততটা বিকশিত হতে পারেনি। পক্ষান্তরে দেবী চৌধুরানী উপন্যাসে তাত্ত্বিকতা কখনো প্রধান হয়ে পারিবারিক সামাজিক কাহিনীকে চাপা দিতে পারেনি। সমালোচকও স্বীকার করেন, “বঙ্কিমের আকাশচারী কল্পনা এই উপন্যাসে মাধ্যাকর্ষণের টান স্বীকার করিয়া মৃত্তিকায় নামিয়া আসিয়াছে।”

'ইন্দিরা' এবং 'রাধারাণী'—এ দুটি প্রকৃতপক্ষে বড় গল্প মাত্র। বঙ্কিম-প্রতিভার কোন প্রতিফলনই এদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না বলে অনেকেই উপন্যাস-আলোচনায় এদের অন্তর্ভুক্ত করেছে।